প্রিয় দেশের জন্য ডাক

হর্ষ মান্দার

তীব্রতম বিভীষিকা আর আতঙ্কের বিহ্বলতা তখন আমাকে বিবশ করে ফেলেছে। নারকীয় সন্ত্রাস এবং গণহত্যার দশদিন পরে মহাপ্রলয়ে বিধ্বস্ত গুজরাট থেকে আমি ফিরছি।

আমার শরীর ও মনে তখন মৃত্যুর চাইতে তীব্র গ্লানির অবসাদ। অতলস্পর্শী অপরাধবোধ আর গ্লানির ভারে বেঁকে যাওয়া আমার কাঁধ ব্যথায় টাটিয়ে উঠছে।

আমেদাবাদে দাঙ্গার ছোবল থেকে যারা বেঁচে গেছে, সেই মৃত্যুতাড়িত মানুষদের ত্রাণ শিবিরের মধ্য দিয়ে যদি যান, ২৯টি শিবিরে ৫৩ হাজার নারী, পুষ আর শিশুর দলাপাকানো নিদাণ অস্তিত্ব চোখে পড়বে। অস্বাভাবিক আঘাতে প্রস্তরীভূত শোকবিহ্বল জনসমষ্টির বিকট প্রদর্শনী!

অকিঞ্চিৎকর ত্রাণসামগ্রী, সম্বল বলতে পৃথিবীতে ওইটুকুই তাদের অবশিষ্ট আছে। শুকনো, নেভা বাতির মত চোখ। কেউ খুব অস্ফুটে কথা বলছে। অন্যরা ত্রাণ শিবিরের অনাত্মীয় অনভ্যস্ত পরিবেশে বেঁচে থাকার দৈনন্দিন কাজে খুব নীরবে ব্যস্ত। শিশুদের জন্য একটু দুধ, বড়দের জন্য যা হোক কিছু একটু খাবার, আহতদের ক্ষতে আশা-ভরসার প্রলেপ।

কিন্তু একবার ত্রাণ শিবিরের যে- কোনও জায়গায় বসলে ওই ত্রস্ত মানুষগুলো কথা বলতে শু করবে। উচ্চারিত প্রতিটি শব্দকে মনে হবে বিশাল এক ক্ষতমুখ থেকে রক্ত-পূঁজের উদ্‌গীরণ। যে অবর্ণনীয় বিভীষিকা আর আতঙ্কের কথা তারা বলে, তা এত তীব্রভাবে পীড়াদায়ক যে, মানুষের স্নায়ু সহ্য করতে পারে না।

গত শতাব্দীতে বিভিন্ন দাঙ্গায় এই দেশ লজ্জায় ঘেন্নায় অধোবদন হয়ে নারী আর শিশুদের ওপরে নির্দয় বর্বরতার যা কিছু দেখেছে, তার চাইতে অনেক বেশি সংগঠিত সশস্ত্র যুববাহিনীর এবারের নৃশংসতা! এ পাশবিকতার কোনো নজির নেই।

যা কিছু দেখেছি আর শুনেছি তারই একটা ক্ষুদ্র অংশ আমি লিখছি। আদতে নিজেকেই নিজে বাধ্য করছি সেই অসহনীয় নরক যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা কিছুটা লিপিবদ্ধ করতে। কেননা, অন্তত কিছু মানুষকে তা জানাতেই হবে। কিংবা এও হতে পারে যে, আমি সেইসব স্নায়ুবিদারক পাশবিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করার দুঃসহ গ্লানি আর বেদনার বোঝাটা একা বহন করতে সত্যিই অক্ষম!

আট মাসের পূর্ণ গর্ভবতী সেই আসন্নপ্রসবা মায়ের আর্তি ...., যে মা তাঁর সন্তানের জন্ম দিতে চেয়ে পৃথিবী কাঁপানো আর্তনাদে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল! হ্যাঁ, দুটো প্রাণের ভিক্ষা! পরিবর্তে, যাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা তারা সেই গর্ভবতী জননীর পেট চিরে বার করে এনেছিল গর্ভস্থ সন্তান। পরিপূর্ণ অবয়বের মনুষ্যশিশুকে। আর কি আশ্চর্য! তখনও সেই আদিম ভয়াল শল্যবিদের অস্ত্রের অহমিকা এড়িয়ে সেই শিশুর দেহে প্রাণ ছিল, যেন শুধু পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ সুরক্ষিত গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে সূর্যের মুখ দেখার জন্যই সেই মরণজয়ী শিশুর বেঁচে থাকা। আকাশ আর পাতাল ছোঁয়া যন্ত্রণায় জীবন-মৃত্যুর মাঝে দুলতে থাকা অপরিমেয় রক্তক্ষরণে পাণ্ডুর জননী তখনও জীবিত। ছিল সন্তানকে বাঁচানোর জন্য সিংহিনীর মত ভয়ঙ্কর প্রতিরোধের নিষ্ফল চেষ্টা। কেননা, ছিন্ন জরায়ু আর উদরের মধ্যেকার পাকস্থলী, অন্ত্র, বৃক্ক, নাড়িভুড়িসহ সবকিছু তখন ধুলো মাটিতে মেশামেশি। ক্রমশ বুজে আসা অক্ষিপল্লবের ঝরোখা দিয়ে শিশুর মুখ দেখেছিল। নরকের মাঝখানে আদিত সব পাশব চিৎকারের মধ্যে শুনেছিল শিশুর প্রথম ক্রন্দন। এতকিছুর পরেও সেই ভুলুণ্ঠিতা জননীর ভাগ্য অবশ্যই সুপ্রসন্ন ছিল- কেননা, চোখ বোজার পরেই ধারালো ত্রিশূলে বিদ্ধ হয়েছিল সেই শিশুর কচি হৃৎপিন্ড। তাতেও ক্ষান্তি নেই, তলোয়ারের এক কোপে সেই শিশুকে দ্বিখন্ডিত করতে ভোলেনি সশস্ত্র যুববাহিনী।

(২)

স্থিরমস্তিষ্কে খুবই পরিকল্পিত এই পদ্ধতির কথা সুস্থ মনের মানুষ কীভাবে চিন্তা করবে - যেখানে প্রথমে ১৯ জনের পরিবারকে তাদেরই ঘরের উঠোন অবদ্ধ করে, হোস পাইপের তীব্র স্রোতধারায় হাঁটু অবধি ডোবানো হল। তারপর হাই-টেনশন বিদুৎ প্রবাহের চালানে সেই অবদ্ধ জলরাশির মধ্যে দন্ডায়মান, অজানা আতঙ্কের ভয়ঙ্কর আঘাতে প্রস্তরবৎ নারী-শিশুসহ ১৯ জনকে হত্যা করা হল! পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া মৃত্যু অভিযানের এই অভাবিত কৃৎকৌশল এত সুচাভাবে সম্পন্ন হয় কীভাবে? এই প্রশ্নের মুখে মনুষ্যত্ব কত নিদাণভাবে অসহায়, তার কোনো উত্তর নেই।

জুহাপাড়ার ৬ বছরের সেই অভিব্যক্তিহীন পাথুরে চোখের ছেলেটির কথা শুনুন। যন্ত্রের মত সেই নারকীয় হত্যার বর্ণনা, শুধুমাত্র লাঠি আর বন্দুকের বাঁটের আঘাতে তার মা আর ৬ ভাইবোনের হত্যাকান্ডের প্রলম্বিত প্রক্রিয়ার মধ্যপথে সংজ্ঞাহীন হওয়ার দণ মৃত ভেবে তাকে ফেলে রেখে প্রমত্ত উল্লাসে ফিরে গিয়েছিল হত্যাকারীর দল। ..... আমেদাবাদের সবচেয়ে উপদ্রুত বসতি অঞ্চলের অন্যতম, নারদাপাতিয়া থেকে মৃত্যুর ভয়ঙ্কর ছোবল এড়িয়ে ত্রাণ শিবিরে আসা অপ্রকৃতিস্থ, অবিশ্বাসী পরিবারটির কাছে সেই যুবতী মেয়ে আর তার ৩ মাসের শিশুর পরিণতির কথা শুনুন। সে নাকি আজন্মলালিত বিশ্বাসে পুলিশকে রক্ষাকারী ভেবে তারই নির্দেশিত নিরাপদ স্থানের দিকে যেতে গিয়ে সোজা পৌঁছেছিল অপেক্ষমাণ ত্রিশূলধারীদের বেষ্টনীর মধ্যে। খুব দ্রুত কেরোসিন তেলের প্রস্রবণে অবগাহনের পর ৩ মাসের শিশুসহ সেই যুবতী জননীকে নিঃশেষে ভস্মীভূত করতে সময় লেগেছিল খুবই সামান্য।

(৩)

আমি এমন কোনো দাঙ্গার কথা জানি না, যেখানে দাঙ্গার হিংস্র হাতিয়ার হিসাবে অকল্পনীয় যৌনবর্বরতার অস্ত্রে অবিশ্বাস্য ব্যাপকতায় নারীদের ছিন্নভিন্ন ক্ষতবিক্ষত করে আমূল বিদ্ধ করা হয়েছে। গুজরাটের আকাশে এখনো ভয়াবহ আবিল প্রশ্বাসের পাশব-শব্দ আপনাকে সেই অন্তহীন বর্বরতার সন্ধান দেবে।

গুজরাটের দশদিক থেকে আসছে গণধর্ষণের অকল্পনীয় পাশবিক সন্ত্রাসের সংবাদ। কিশোরী বালিকা থেকে যুবতী নারীদের তাদেরই পরিবারের পুষদের সামনে পেড়ে ফেলে পর্যায়ক্রমে ধর্ষণ; আর ছুরি ভোজালি কিংবা ত্রিশূলে বিদ্ধ থাকা বাপ, দাদু, স্বামী বা পুত্রের মৃত্যুকালীন যন্ত্রণার মধ্যে গভীরতম আরেক যন্ত্রণাকে

প্রত্যক্ষ করার দুঃসহ যন্ত্রণা!.....

একদিকে কন্যা কিংবা পুত্রবধূ জায়া কিংবা জননীকে মাটিতে পেড়ে ফেলে ত্রিশূলধারীদের রমণের তীব্র চীৎকার, অন্যদিকে শরীরের সব শক্তি নিঃশেষ করে প্রতিরোধের নিস্ফলা চেষ্টার পর গভীর অবসাদের মাঝে অপেক্ষমান ধর্ষণকারীদের হাতুড়ির ঘায়ে স্বামী, পিতা কিংবা ভাইয়ের মাথার খুলি ফাটার স্নায়ু-বিদারক ভয়ঙ্কর শব্দ! অনেক ক্ষেত্রে পেট কিংবা মাথা স্ক্রুড্রাইভারে বিদ্ধ করে কুশলী প্রযুক্তবিদের মত যন্ত্রণা এবং মৃত্যুকে নিংড়ে আনার প্রলম্বিত সফল চেষ্টা।

ত্রাণ শিবিরে, আমানচক থেকে বেঁচে ফিরে আসা মেয়েদের কাছে যদি যান আপনাকে শক্ত স্নায়ুর মানুষ হতে হবে। কেননা, সেই অভাগিনীরা আপনাকে শোনাবে সেই অবিশ্বাস্য নিদাণ ঘটনার কথা - যেখানে গণধর্ষণে ক্ষতবিক্ষত মেয়েদের বিবস্ত্র রেখেই বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। আতঙ্কে চলৎশক্তিরহিত যূথবদ্ধ জন্তুর মত তারা তখন দ্বিতীয় আঘাতের আশংকায় জড়োসড়ো জীবন্ত মাংসস্তূপের মত এককোণে অপেক্ষমান। তাদের কাপড় দেওয়া হয়নি। পৃথিবীর সভ্যতা এবং মনুষ্য অনুভূতির সবচেয়ে বড় উদ্দীপক লজ্জাকে কেড়ে নিয়ে বিবস্ত্র করে বসিয়ে রাখা হয়েছে। সেখানেই দলবদ্ধভাবে এসে দাঁড়িয়েছে ক্লীবত্ব আর অপরিমেয় বিকৃতির সশস্ত্র জানোয়ারেরা। নিজেরাই উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে ওই জীবন্মৃত মেয়েদের সামনে। তারপর মাতৃসমাকে ধর্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছে পুত্রের বয়সী ত্রিশূলধারীকে, বাপের বয়সী সংঘী কুকুরের মত রমণ করেছে কন্যাসমা কিশোরীকে, মধবয়সিনীকে কিশোর, ফুটফুটে বালিকাকে প্রৌঢ় পর্যায়ক্রমে চলেছে অবর্ণনীয় যৌন সন্ত্রাস।

এই কথাগুলি আপনাদের শুনতেই হবে। আপনি কানে হাত চেপে সেই অবসন্ন, রক্তক্ষরণে, ধর্ষণে ধবস্ত, মনুষ্যত্বের সবচেয়ে মহার্ঘ উপকরণ আব্রু কিংবা বসনভূষণ হারানো মেয়েদের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে পারবেন না।

(৪)

আমেদাবাদে যাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে - সমাজকর্মী, সাংবাদিক নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে অবিশ্বাস্যভাবে বেঁচে ফিরে আসা ত্রাণ শিবিরের মেয়ে পুষ; সকলেরই নিশ্চিত ধারণা যে, গুজরাতে যা ঘটেছে তা কিছুতেই দাঙ্গা নয়। সন্ত্রাসবাদীদের সংগঠিত বর্বরতা। সুসংবদ্ধ, সুপরিকল্পিত গণহত্যা, নিছিদ্র প্রস্তুতির অকল্পনীয় ধবংসলীলা।

সকলের স্পষ্ট এবং দৃঢ় অভিমত- এ হল সর্বস্ব লুঠ করে অচিন্তনীয় বর্বরতায় সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে অর্থনৈতিকভাবে একটি সম্প্রদায়কে ধবংস করা, যে নৃশংসতা শুধুমাত্র বাইরের সশস্ত্র শত্রুর বিদ্ধে সামরিক অভিযানেই চালানো হয়।

প্রথমে ট্রাকে করে ভয়ঙ্কর প্ররোচনার বিস্ফোরক ঘোষণা করতে করতে এলাকা প্রদক্ষিণ করা। পেছনে আরও ট্রাক, তাতে উন্মও হিংস্র সশস্ত্র যুববাহিনী। স্নায়ু বিদারক প্ররোচনায় তাদের আগে থেকেই মানবিক সব বিচারবোধকে ভোঁতা করে প্রস্তুত করা হয়েছে গণহত্যার অভিযানের জন্য।

প্রত্যেকের পরনে খাঁকি হাফপ্যান্ট। মাথায় বাঁধা গেয়া কাপড়ের হেডব্যান্ড, কিংবা কোমরে গামছার মত বাঁধা গেয়া কাপড়। প্রত্যেকে অত্যাধুনিক বিস্ফোরক উপকরণ বহন করছে। আর সেই সঙ্গে দেশীয় অস্ত্র, ভোজালি, ছুরি, তলোয়ার আর ত্রিশূল। দীর্ঘস্থায়ী অভিযানের ধকলে যাতে গলা শুকিয়ে না যায়, তার জন্য প্রত্যেকের কাছে জলের বোতল। নেতাদের প্রত্যেকের হাতে মোবাইল ফোন। দাঙ্গা বিধবস্ত পোড়া মাটিতে দাঁড়িয়ে অভিযানের সাফল্য সম্পর্কে সদরদপ্তরে তাৎক্ষণিক যোগাযোগের উল্লসিত ব্যস্ততা। নতুন অঞ্চলে আক্রমণের ঘনঘন নির্দেশ। নির্দেশ পালনের পর সমন্বয় কেন্দ্রে ফলাফল, মৃতের সংখ্যা, অগ্নিকান্ড, লুঠ, ধর্ষণের সংখ্যাতত্ত্বের বার্তা পাঠানো। সবকিছু আশ্চর্য নিয়মবদ্ধ সমযানুবর্তিতায় গ্রন্থিত, যেমনটি আধুনিক সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধে থাকে।

এদেরই সঙ্গে কম্পিউটারের বিশ্লেষিত তালিকায় সম্প্রদায়গত সম্পত্তির সরকারি নথির কপি নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক বাহিনী। তারাই চিহ্নিত করছে মুসলিমদের বাসস্থান, দোকানপাট, কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলি। তাদের কাছে এই সম্প্রদায়ের প্রতিটি বাড়ি, ব্যবসার সুনির্দিষ্ট হদিশ আছে। কোন্ হিন্দু রেস্টুরেন্ট মালিকের ব্যবসার অংশীদার মুসলিম- হিন্দু মালিককে যেন আর অংশীদারিত্বের বোঝা বহন করতে না হয়, কোন্ মুসলিম বাড়ির পুত্রবধূ হিন্দু-মুসলিম বাড়িতে আগুন লাগিয়ে সবাইকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার আগে হিন্দু-বউটিকে যাতে বার করে নেওয়া হয়-ওই উন্মত্ততার মাঝেও সবকিছু নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে পূর্ব নির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক।

এটা কিছুতেই স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষের অভ্যুত্থান হতে পারে না। নিরঙ্কুশ সতর্কতায় গৃহীত গণহত্যার পরিকল্পনা ছাড়া এত হিসেবি হয় না হঠাৎ ক্রোধের উদ্গীরণ।

(৫)

ট্রাকে করে গ্যাস সিলিণ্ডার আনা হয়েছে। প্রথমে ধনী মুসলিমদের বাড়ি আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি লুঠ করা হয়েছে নিঃশেষে। বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে যাতে মূল্যবান কোনকিছু না ভাঙে, অপচয় কিংবা নষ্ট না হয়। এমনকি দামি জামাকাপড়, গয়না, ঘড়ি, জুতো পর্যন্ত খুলে নারীদের বিবস্ত্র করা হয়েছে রোবটের মত যান্ত্রিক নির্লিপ্ততায়। সব সারা হলে সিলিণ্ডারে গ্যাস রিলিজ করা হয়েছে বেশ কয়েক মিনিট ধরে। তারপর, বিশেষজ্ঞ খাঁকি প্যান্টরা আগুন লাগানোর কাজটা সেরেছে নিরাপদে। মুহূর্তে লেলিহান শিখা আর নিকষ কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে সুউচ্চ অট্টালিকা, দোকান অফিস ঘরগুলি। বুক ফাটা আর্তনাদ, জ্যান্ত মানুষের মাংস মজ্জা শিরাতন্তু আর রক্ত পোড়ার তীব্র বমনোদ্রেককারী কটু গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। মোবাইল ফোনে কার্যসিদ্ধির বার্তা চলে গেছে সদরদপ্তরে।

অনেকক্ষেত্রে স্টিল ওয়েল্ডিং-এর জন্য ব্যবহৃত অক্সি-অ্যাসিটিলিন গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে কংক্রিটের মজবুত দেওয়াল আর বাড়ির ভিত ফাটানোর জন্য।

শহরের সব মসজিদ আর দরগাগুলি ভেঙে ধূলিসাৎ করে সেখানে হনুমান মূর্তি আর গেয়া ঝাণ্ডা পুঁতে দেওয়া হয়েছে।

আমেদাবাদ শহরের ত্রসিংগুলিতে বেশ কিছু দরগা ছিল। রাতারাতি সেগুলি ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ইট, ভারি পাথর দিয়ে মুড়ে পিচ ঢেলে সেগুলি মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে রাস্তার সঙ্গে। এখন আর গিয়ে সেই দরগাগুলিকে চিহ্নিত করা তো দূরের কথা, পাকা অ্যাসফল্ট-এর মসৃণ রাস্তায় কোনোকালে যে সেখানে দরগা ছিল, তা মনে হবার উপায় নেই।

(৬)

এই অকল্পনীয় সন্ত্রাসের নেপথ্যে প্রশাসন আর রাজ্য-পুলিশের হৃদয়হীন সক্রিয়তার প্রসঙ্গটি এখন সবার কাছে দিনের আলোর মত পরিষ্কার।

জানা যাচ্ছে যে, প্রাণ ভয়ে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের রক্ষা করার নামে পুলিশই তাদেরকে সরাসরি দাঙ্গাবাজদের হাতে তুলে দিয়েছে। প্রতিটি লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড, ধর্ষণ আর গণহত্যা নির্বিঘ্নে সমাধা হবার গতিপথে পুলিশই ঢাল হিসাবে নিরাপত্তা দিয়েছে দাঙ্গাবাজ-সন্ত্রাসবাদীদের। মুসলিমদের, তাদের মধ্যে নারী আর শিশুদের আকুল আবেদনেও অবিচলিত থেকেছে মূক বধিরের মতো।

বহু ঘটনা আছে যেখানে পুলিশ প্রাণভয়ে পালাতে থাকা সংখ্যালঘুদের গুলি করেছে, যারা সশস্ত্র হিংস্র দাঙ্গাবাদদের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

যে বিশাল সংখ্যক গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের সিংহভাগই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরস্ত্র নিরীহ মানুষ। তারাই ছিল গণহত্যার প্রধান লক্ষ্য।

একজন, ইণ্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে (ঢট্টত্র)দু-দশকের বেশি কাজ করছেন; পুলিশ আর সাধারণ প্রশাসনে তাঁরই সমপদমর্যাদার সহকর্মীদের এই অবিচলিত নিষ্ক্রিয়তা আর ক্লীবত্ব, তাঁকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে লজ্জায় আর অপরিসীম গ্লানিতে। অথচ এদের কারোরই মাথার উপরে রাজনৈতিক কর্তাব্যাক্তিদের নির্দেশের অপেক্ষায় বসে থাকার আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল না।

রক্ষাবাহিনীকে দ্রুত সংগঠিত করে ক্রমশ বাড়তে থাকা বর্বরতার বিদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া যেত। দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ার আগেই নিভিয়ে ফেলা যেত উন্মত্ত হিংসার আগুন। সংগঠিত হত্যাকারীদের হাত থেকে বাঁচানো যেত অসহায় নারী আর শিশুদের।

রাজনৈতিক নেতাদের অভিসন্ধি যাই থাক, আইনের নির্দেশ ছিল নিরপেক্ষভাবে অকুতোভয় পক্ষপাতহীন নির্দেশাত্মক সাহস আর সহমর্মিতায় সক্রিয় ভূমিকা পালনের। এমনকি, যদি আমেদাবাদের একজনও এমন করতো, আইনের নির্দেশ মেনে পুলিশ বাহিনীর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে থেকে সেনাবাহিনীকে তলব করে এই হিংসা বন্ধের এবং আক্রান্ত মানুষদের রক্ষা করার তাৎক্ষণিক নির্দেশ জারি করে যদি বলত-এক্ষুণি থামাও এসব , তাহলে দাঙ্গার আগুন নিভে যেত মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে। কারণ, আঞ্চলিক পুলিশ আর প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ইন্ধন ছাড়া কোনো দাঙ্গার আগুনই কয়েক ঘন্টার বেশি জ্বলতে পারে না। অথচ গুজরাটে পুলিশ আর প্রশাসন কর্তৃপক্ষের হাতেই এখন খুন হওয়া নিরপরাধ কয়েকশো মানুষের রক্তের দাগ। এবং তাদের আশ্চর্য নীরবতার চক্রান্তে সামিল হবার দায়ে এদেশের উচ্চতর অমলাবাহিনীর হাতও সমানভাবে কলুষিত।

(৭)

এই হৃদয়বিদারক হিংস্রতায় যুক্ত থাকার জন্য অনেক পদস্থ পুলিশ অফিসারকেই শুনেছি পুলিশবাহিনীর অধস্তনদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে দায়ী করতে। এত নিম্নমানের অন্তঃসারশূন্য মিথ্যাচার আর কিছু হতে পারে না।

এই একই বাহিনী যখন দায়িত্বের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ ও নৈতিকতার নির্দেশে আর আইনের প্রতি সত্যনিষ্ঠ যথার্থ প্রফেশনাল কোনো অফিসারের নির্দেশে পরিচালিত হয়, তখন এরাই তো নিরপেক্ষ থেকে সাহসের সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করার জন্য আদৃত হয়। সুতরাং, ব্যর্থতাটা নিশ্চিতভাবেই পুলিশবাহিনী আর প্রশাসনের নেতৃত্বের, নিচের তলার সেই অধস্তন উর্দিধারী পুষ কিংবা মহিলা রক্ষীবাহিনীর নয়। এদেরকে তো উপরতলার আদেশ পালন করার জন্য কঠোর প্রশিক্ষণে গড়ে তোলা হয়েছে।

(৮)

এই ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলার, অন্যায় আর মানবিকতার এই অপরিমেয় লাঞ্ছনার সময়ে সেই 'নাগরিক সমাজ' কোথায় ছিল? কোথায় ছিল শান্তি আর অহিংসার প্রচারক গান্ধীবাদীরা? কোথায় ছিল পৌরাণিক গল্পকথার মানবপ্রেমী অহিংস নিরামিষাশী গুজরাটি লোকহিতবাদীরা, যাঁদের মহানুভবতার কথা কচ্ছ আর আমেদাবাদের ভূমিকম্পের পরে লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছিল জনপ্রিয় উপকথার মতো?

সংবাদপত্র খবর করেছে- গণহত্যার ভয়ঙ্কর মনোবিকলনের দিনগুলিতে শুধুমাত্র নিজেদের সম্পত্তি বাঁচাবার অজুহাতে সবরমতি আশ্রমের মজবুত গেটটাও তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছিল ভেতর থেকে। অথচ উন্মত্ত হত্যা, ধর্ষণ আর নির্বিচার অগ্নিকাণ্ডের দিনগুলিতে তাড়া খাওয়া সংখ্যালঘুদের কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ অভয়াশ্রম হতে পারতো এই সবরমতিই।

কিন্তু কোন্ গান্ধীবাদী নেতা, এন জি ও -ম্যানেজার সেই উন্মত্ত মৃত্যুব্যাবসায়ীদের বিদ্ধে নিজের জীবন বিপন্ন করে খে দাঁড়িয়েছিলেন?

(৯)

এই দেশের নাগরিক হিসেবে আর এক অসহনীয় লজ্জা, অপরাধ এবং গ্লানির বোঝা আমাদের ন্যুব্জ কাঁধে বহন করতে হবে।

আমোদাবাদ-দাঙ্গায় সব হারানো মুসলিম সম্প্রদায়ের ছিন্নমূল মানুষদের ত্রাণ শিবিরের সবকটাই চালাচ্ছে মুসলিম সংগঠনগুলি। যে অন্তহীন বেদনা, সব হারানোর সীমাহীন উদ্বেগ, যে ঝিাসঘাতকতা এবং প্রতারিত হওয়ার যন্ত্রণা, যে অন্যায়ের ভয়ঙ্কর পীড়নে মুসলিম জনগণ পীড়িত হয়েছে- যেসব হৃদয় নিংড়ানো ব্যথায় সমব্যথী শুধু অন্য মুসলিমরাই। কিন্তু আমাদের কোনো দায় নেই সেই যন্ত্রণা লাঘবে, ক্ষত নিরাময়ে, বিধবস্ত জীবনের পুনর্নির্মাণে, সেই অসহনীয় অপরাধে অনুতপ্ত হওয়ার! যেন এক আশ্চর্য নির্বিকল্প ক্লীবত্বের সুড়ঙ্গে সরীসৃপের মতো আমাদের তৃপ্ত জীবনের বাস!

একটা রাজ্যের আক্রান্ত সম্প্রদায়ের জীবন আর সম্পত্তির নিরাপত্তার দায় প্রধানত রাষ্ট্রের, সরকারের। অথচ ২৯টি অস্থায়ী শিবিরের কোনো একটাতে গিয়েও আপনি সরকারের ন্যূনতম অস্তিত্ব টের পাবেন না। গুজরাট সরকার কোথাও কোনও ক্ষেত্রে কোনো ত্রাণ শিবিরের ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেনি, বা শুধু খুন কিংবা জ্যান্ত পুড়ে মরা পিতামাতার অনাথ শিশুদের জন্য দু'বেলা দু'ফোঁটা দুধের ব্যবস্থাও তারা করেনি। এক বস্তা গম কি চালও দেয়নি ৫৩ হাজার অরক্ষিত স্বজন হারানো আতঙ্কে সিঁটকে থাকা ছিন্নমূল মানুষদের জন্য-যাঁরা একটু নিরাপত্তার খোঁজে, শুধু বেঁচে থাকার ভরসাটুকু পাবার জন্য এই ত্রাণ শিবিরগুলিতে আশ্রয় নিয়েছে।

(১০)

এই ভয়াবহ নৈরাজ্যের নরক পরিক্রমায় আমার মানুষ হিসেবে গর্বিত ও আশাবাদী হবার মত একমাত্র অভিজ্ঞতা হল-আমি সজিদ আহমেদের মতো মানুষ আর রেশন বহেনের মত জন্ম-জননীকে দেখেছি। ত্রাণ শিবিরগুলিতে ঘুরে ঘুরে সুগভীর মানবিকতার ক্লান্তিহীন, ছেদহীন তাড়নায় এঁরা অহোরাত্র কাজ করে চলেছেন। চারিদিকে পোড়ামাটি আর রক্তক্ষরণের চিহ্, চারিদিকে ভয়ঙ্কর আগ্রাসী ধ্বংসের ইতস্তত ভগ্নস্তুপ। অথচ মগ্ন বিভঙ্গে আমি কখনো দেখিনি।

আমনচকের ত্রাণ শিবিরের আশ্রিতারা দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর তণ সদস্যদের; তারা প্রত্যেকেই ভোর চারটের সময় উঠে রাত একটার পর শুতে যায়- যেন কোনো শিশুই ক্ষুধার জ্বালায় কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে না পড়ে। যেন প্রতিটি দুধের শিশু দুধ পায় দু'ফোঁটা, যেন প্রতিটি ক্ষতে পড়ে নিরাময়ের প্রলেপ।

এদের নেতা মজিদ আহমেদ একজন স্নাতক। একটা ছোট কেমিকাল ডাউস ফ্যাক্টরি ছিল তাঁর। সেটা এখন ছাইয়ের গাদা। কিন্তু নিজের সর্বস্ব হারানো নিয়ে তাঁর এখন হা-হুতাশ করার সময় নেই। কারণ, এখন প্রতিদিন সকালে ১৬০০ কেজি চাল অথবা গম যাই হোক, তাঁকে জোগাড় করতেই হবে। ৫০০০ মানুষ এই শিবিরে আছেন। তাঁদের পেট ভরাবার জন্য এটা চাই-ই।

এই চ্যালেঞ্জটা রোশন বহেনের কাছে আরো কঠিন। বয়স ৬০। জুহাপাড়ার ক্যাম্পে ছিন্নমূল মানুষ আর মেয়েরা এসে তাদের বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে বসলে প্রতিবার রোশন বহেনের চোখ জলে ভরে যায়। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে জল মোছেন, আবার উঠে দাঁড়ান। ত্রোধ কিংবা শোকে বিলাপ করার মত বিলাসী সময় তাঁর মোটেই নেই। কার্যত কোনো রাতেই রোশন বহেন চোখের পাতা এক করতে পারেন না।

তাঁর স্বেচ্ছাসেবীরা মূলত শ্রমজীবী মুসলিম মহিলা আর পুষ, ক্যাম্পের কাছে দুস্থতার চিহ্নমাখা বস্তিতে তাঁদের বাস। তাঁরাই মেয়েদের স্নানের ঘর, প্রাকৃতিক কাজ সারার জন্য নিজেদের বস্তিটা ছেড়ে দিয়েছেন। সামান্য পেট ভরাবার মত খাবার আর হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত সান্ত্বনায় তাঁরা বুকে টেনে নিয়েছেন এই প্রাইমারি স্কুলে জড়ো হওয়া কয়েকশো শরণার্থীকে। এইসব ক্যাম্পের ভেতরে ঘুরতে ঘুরতে আমি মনে মনে উত্তর খুঁজি এমন একটা অন্ধকার মুহূর্তে থাকলে গান্ধীজি কী করতেন?

কলকাতা রায়টের সেই ঘটনাটা আমার মনে পড়ছে। গান্ধীজি তখন শান্তির জন্য অনশন করছেন। একজন হিন্দু-পিতা তাঁর কাছে এসে জানালো যে, তার কিশোর ছেলেকে মুসলিমদের এক উন্মত্ত জনতা হত্যা করেছে। ভয়ঙ্কর ত্রুদ্ধ পিতা তার প্রতিশোধ নিতে চায়। শোনা যায় যে, গান্ধীজি পুত্রশোকে অন্ধ সেই পিতাকে

বলেছিলেন-যদি সত্যিই তুমি এই যন্ত্রণা ভুলতে চাও, এমন একটি ছেলেকে খুঁজে বার করো, যে তোমারই সন্তানের বয়সী। একটি মুসলিম ছেলে, যার পিতা-মাতা খুন হয়েছে হিন্দু দাঙ্গাবাজদের হাতে। নিজের সন্তানের মতো স্নেহ মমতায় বড় করে তোলো সেই ছেলেকে। কিন্তু যে পরিপ্রেক্ষিতে সে জন্মেছে, সেই মুসলিম বিশ্বাস নিয়েই তাকে বড় হতে দাও। তাহলেই তুমি পুত্রশোক থেকে, ক্রোধ ও প্রতিশোধের তীব্র দাহ থেকে মুক্তি পাবে।

আজকে গান্ধীজির মত মানবিকতার গভীর কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় না। উল্টে দাঙ্গা আর বদলা নেবার পাশবিকতাকে বৈধতা দেবার জন্য নিউটনের পদার্থবিদ্যার সূত্র আওড়ানো হয় নির্লজ্জভাবে।

গান্ধীজির কথাগুলি নিজের হৃদয় থেকে শুনতে হবে আমাদের। আমাদেরকে ন্যায়, ভালবাসা আর সহনশীলতার চিরকালের মানবিক বিশ্বাসে অবিচলিত থাকতেই হবে।

গুজরাটের উন্মত্ত দাঙ্গাবাজরা আমার একান্ত নিজস্ব অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে। তারমধ্যে অন্যতম সেই উজ্জীবনী সংগীত, গভীর গর্ববোধ আর বিশ্বাস থেকে আমি যে গান প্রায়শই গাইতাম। সেই গানের কলিটা এ'রকম-

'সারে জাঁহাসে আচ্ছা, হিন্দুস্থাঁ হামারা'। এই গান আমি আর কোনদিনই গাইতে পারবো না।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com